অলিভিয়ার ডি শ্যুটার-এর সফর-সংক্রান্ত বিবৃতি

চরম দরিদ্রতা ও মানবাধিকার-বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সফর, ১৭ থেকে ২৯ মে ২০২৩

ঢাকা ২৯ মে, ২০২৩

চরম দরিদ্রতা ও মানবাধিকারবিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সফর: ১৭ থেকে ২৯ মে ২০২৩

সফর-সংক্রান্ত বিবৃতি

I. ভূমিকা

চরম দারিদ্র্য এবং মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক অলিভিয়ার ডি শ্যুটার, ১৭মে থেকে ২৯মে এর মধ্যে বাংলাদেশে একটি সরকারী সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাকে আমন্ত্রণের জন্য এবং সফরের সময় সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঢাকা এবং এর আশেপাশে (ধলপুর, মাতুয়াইল, গাজীপুরসহ) বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের পাশাপাশি বিশেষ প্রতিবেদক রংপুর বিভাগ, কুড়িগ্রাম এবং কক্সবাজারের উখিয়া শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কক্সবাজারে তিনি শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এবং ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজধানীতে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে। তিনি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাশাপাশি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন।

বিশেষ প্রতিবেদক বেশ কিছু মানবাধিকারকর্মী, শিক্ষাবিদ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (দলিত, আদিবাসী, বেদে, হিজরা, ভাষাগত সংখ্যালঘু যেমন বিহারী এবং জলবায়ু প্রভাবিত অভিবাসী) প্রতিনিধিদের সাথেও বৈঠক করেছেন।এছাড়াও তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসকারী ব্যক্তি, কর্মী, আইনজীবী, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বহুমাত্রিক বৈষম্য মোকাবেলায় কাজ করা সুশীল সমাজ সংগঠন, চিন্তাশীল সমাজ প্রতিনিধি, সংগঠিত ও অসংগঠিত পোশাক শ্রমিক, অন্যান্য শ্রমিকদের (বর্জ্যপাকার, ফুটপাথের বাসিন্দা, গৃহস্থালী, নির্মাণশ্রমিকসহ) সাথে সাক্ষাৎ করেন।এবং এছাড়াও তিনি রাজমিস্ত্রি শ্রমিক, হকার, রিকশাচালক, বাড়ির শ্রমিক এবং রাস্তার বিক্রেতা) এবং ট্রেড ইউনিয়নে যারা বিদেশী অভিবাসী শ্রমিকসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।বিশেষ প্রতিবেদক কক্সবাজারের উখিয়ায় শরণার্থী শিবিরও পরিদর্শন করেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।প্রতিবেদক তার সফরের সময় জাতিসংঘের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিশেষ প্রতিবেদক সাক্ষাৎ করেছেন এমন সব ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এবং তাদের দক্ষতা এবং জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপকৃত হয়েছেন বলে মত ব্যক্ত করেন। তার পরিদর্শন নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অবহিত করে:

II. দারিদ্র্য ও অসমতা বা বৈষম্যের সাধারণ অবস্থা

“কস্ট অব ব্যাসিক নিডস্ অ্যাপ্রোচ” বা মৌলিক চাহিদা-ব্যয় পদ্ধতি-নির্ভর আনুষ্ঠানিক দারিদ্র্য সীমার উপর ভিত্তি করে, বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসে চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি করেছে। ২০০০ সালে, শতকরা ৪৮.৯ ভাগ বাংলাদেশি উচ্চ দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী দরিদ্র হিসাবে গণ্য হয়েছিল; ২০২২ সালের মধ্যেএটি কমে ১৮.৭ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। নিম্ন দারিদ্রসীমার জন্য এ সূচক ৩৪.৩ ভাগ থেকে ৫.৬ ভাগে নেমে এসেছে।গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য কমেছে। ২০২২ সাল নাগাদ, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী শতকরা ২০.৫ ভাগ বাংলাদেশি দারিদ্র্যের মধ্যে ছিল, যখন শহর এলাকায় এই পরিসংখ্যান ছিল ১৪.৭ ভাগ; চরম দারিদ্র্যের পরিসংখ্যান ছিল গ্রামীণ এলাকায় ৬.৫ ভাগ এবং শহরাঞ্চলে শতকরা ৩.৮ ভাগ।যদিও চিত্রটি উপরোক্ত হিসেবের মতো চিত্তাকর্ষক নয়, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য হ্রাস সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ: বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) পদ্ধতি ব্যবহার করে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান সূচকগুলির একটি সংমিশ্রণ), জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) গবেষণা করে বের করেছে যে, বাংলাদেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে জনসংখ্যার বহুমাত্রিক দারিদ্র্য ৩৭.৬ ভাগ থেকে কমে ২৪.১ ভাগে নেমেছে।

যাইহোক, সাধারণ সূচকগুলো গোটা চিত্রটি তুলে ধরেনা। প্রথমত, আয় বৈষম্য বাড়ছে। গিনিকো এফিসিয়েন্ট – এর সূচক অনুযায়ী, আয়ের বৈষম্য ২০১০ সালে ০.৪৫৮-তে দাঁড়িয়েছিল এবং ২০২২ সাল নাগাদ ০.৪৯৯-এ উন্নীত হয়েছিল (সেই সময়ের মধ্যে ভোগের বৈষম্য ০.৩২১ থেকে ০.৩৩৪ নাগাদ বেড়েছে)। বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) বৈষম্য কমানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বৈষম্য উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় ফলাফল হতে পারেনা। এবং যত বেশি সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তত দ্রুত দারিদ্র্য দূর হবে।

দ্বিতীয়ত, "নতুন দরিদ্র" নামক একটি শ্রেনী আবির্ভূত হচ্ছে: এগুলো এমন পরিবার যা দারিদ্র্যসীমার ঠিক উপরে রয়েছে, অথচ যাদের কোনো সঞ্চয় নেই।তারা সামান্য নড়বড়ে হলেই দরিদ্র হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ। কোভিড-১৯-এর প্রভাবের উপর একটি সমীক্ষা এই দুর্বলতাকে তুলে ধরেছে: সমীক্ষায় অংশ নেওয়া তিন চতুর্থাংশেরও বেশি (৭৭%) যারা শহুরে অনানুষ্ঠানিক বসতি বা বস্তি এলাকায় বসবাস করছিলেন এবং যারা দরিদ্র ছিলেন না এবং যাদের আয় মধ্যম আয়-স্তরের নিচে ছিল কিন্তু তারা ২০২০ সালে প্রথম দেশব্যাপী লকডাউনের পরে দারিদ্র্যের স্তরে নেমে পড়ে। যদিও গ্রামীণ এবং শহুরে অনানুষ্ঠানিক বসতি এলাকায় দারিদ্র্যের প্রাথমিক বৃদ্ধি একইরকম ছিল, শহরাঞ্চলে পুনরুদ্ধার খুব ধীরগতিতে হয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের ঢাকাকেন্দ্রিক ২০২২ সালের জরিপে দেখা গেছে যে, দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা ৫১% লোক সম্প্রতি দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে নতুন দরিদ্র হয়ে উঠেছে। অন্যকথায়, দারিদ্র্য হ্রাসে সাধারণ অগ্রগতি স্থিতিশীল নয়: অনেক পরিবার, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, দারিদ্র্য-ঝুঁকিতে আছে। এই ধরনের পটভূমিতে, মুদ্রাস্ফীতি একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ২০২৩ সালের এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি অনুমান করেছে ৯.২% (খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল৮.৮%), এবং প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হচ্ছে দরিদ্রতম মানুষ, যাদের জীবন ধারণে আয়ের একটি উচ্চ অনুপাত ব্যয় করতে হবে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ প্রতিবেদক যাদের সঙ্গে দেখা করেছেন তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। মুদ্রাস্ফীতি দরিদ্রতম মানুষের শত্রু: এর ফলে স্বল্প আয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা এবং দ্রুত খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা, জীবনযাত্রার মানের পতন এবং ঋণগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

এই কারণেই, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার চেষ্টার পাশাপাশি সরকারের উচিত পরিবার গুলোর ঝুঁকি প্রতিরোধ ক্ষমতা

জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করা। এবং ফলস্বরূপ, আয় বৈষম্যসহ সম্পদ বৈষম্যের আশু সুরাহা করা উচিত।

এটি শুধুমাত্র গণনা-পরিমাপ দ্বারা অর্জন সম্ভব হতে পারে।বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গৃহস্থালী আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) সম্পর্কিত সংস্থার সাথে তার আলোচনায়, বিশেষ প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে, এইচ আই ই এস-এর সীমাবদ্ধতাগুলো বিস্তারিত এলাকা-ভিত্তিক দারিদ্র্য ম্যাপিংকে বা নিরুপণকে বাধা দেয়, যা এর উপযোগিতাকে সীমিত করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকায় দারিদ্র্য নিরুপণ করা।

তাছাড়া আয়ের পরিমাপগুলি গুরুত্বপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও, HIES-এর পরবর্তী প্রজন্মের বাস্তব অগ্রগতিকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করার জন্য দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। অভিঘাত মোকাবেলায় পরিবারগুলোর স্থিতিস্থাপকতা উন্নত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এসডিজি লক্ষ্য-১ এর জন্য দেশগুলোকে জাতীয় সংজ্ঞা অনুসারে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের মধ্যকার দারিদ্র্য নিরুপণ করতে হবে এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) ইতিমধ্যেই একটি জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরুপনের প্রস্তাব দিয়েছে। পরিদর্শনকালে, বিশেষ প্রতিবেদককে বহুমাত্রিক শিশু দারিদ্র্যের দিকে নজর দেওয়ার জন্য ২০১৯ সালের MICS জরিপ ব্যবহার করে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ / ইউনিসেফ রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেদনটি আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, এটি সম্ভবত ফলাফলের সংবেদনশীল প্রকৃতির চিত্র তুলে ধরে।একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দারিদ্র্যের লোকেদের অবস্থা এবং অভিজ্ঞতাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করবে এবং ব্যক্তিগত খরচ বৃদ্ধির জন্য বা আয় বাড়ানোর জন্য নয়,

জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য জনপণ্য সরবরাহের দিকেও প্রয়াস চালাবে।

উপরন্তু, দারিদ্র্য কীভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য বৃহত্তর ভিন্নতা এবং মানবাধিকার সূচকের ব্যবহার প্রয়োজন। ডিস্যাগ্রিগেশনে বা জনগোষ্ঠী পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় বয়স, লিঙ্গ এবং পরিবারের ধরন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত; পটভূমি (আদিবাসী গোষ্ঠী, জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে); স্বাস্থ্য এবং অক্ষমতা অবস্থা; পেশা; জমিতে প্রবেশাধিকার; মাইগ্রেশন অবস্থা; এবং অবস্থান (শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে)। এটি জনসংখ্যার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে পিছনে ফেলেছে কিনা তা মূল্যায়ন করার অনুমতি দেবে। এই সমস্যাটি পাবলিক পলিসিতে বা জননীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে এবং এটি সমাধানে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

III. দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পূর্বশর্ত

এই সফরের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সেগুলো নিরুপণ করা। এইক্ষেত্রে অগ্রগতি কেবল তখনই অর্জন করা যেতে পারে, যদি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সুশীল সমাজগোষ্ঠী এবং সাংবাদিকরা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পান এবং দুর্নীতি ও দুর্বল শাসনের বিরুদ্ধে নজরদারি হিসাবে কাজ করাসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে অংশগ্রহণের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। যদি শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়; যদি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে বিকল্প প্রস্তাব করার অনুমতি দেওয়া হয়; এবং যদি মানবাধিকার কর্মীরা সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি উভয়কেই জবাবদিহি করতে

পারে, তবেই অগ্রগতি সম্ভব। তাছাড়া, সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি কেবলমাত্র সমানভাবে ভাগ করা সম্ভব হবে যদি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে কার্যকরভাবে সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা হয়। পরিশেষে, জনসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষার অর্থায়নের জন্য দেশীয় সম্পদের গতিশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। এগুলো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পূর্বশর্ত।

১. **নাগরিক সুবিধা বা সিভিক স্পেস সংরক্ষণ**

এই প্রেক্ষাপটে, মানবাধিকার কাউন্সিলের অন্যান্য বিশেষ কার্যপ্রণালী এবং তার বাংলাদেশ সফরের সময় মানবাধিকারের একজন প্রতিনিধি হিসাবে, বিশেষ প্রতিবেদক গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিভিক স্পেস বা নাগরিক-সুবিধা গুরুতরভাবে সীমিত করা হয়েছে। বিশেষকরে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (২০১৮) ইন্টারনেটসহ স্বাধীন চিন্তা ভাবনা এবং কণ্ঠস্বরকে দমন করতে ব্যবহৃত হয়েছে। মানবাধিকার কর্মী, ছাত্র, কর্মী, সাংবাদিক, বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদদের হয়রানি করা হয়েছে, আটক করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে, হেফাজতে থাকাকালীন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে – যার ফলে মৃত্যু হয়েছে। একটি থিঙ্কট্যাঙ্কের বা বুদ্ধিজীবী মহলের মতে, গত চার বছরে মোট ২,৮৮৯ জনকে এই আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, মুক্তিযুদ্ধের সমালোচনা, কোভিড-১৯ সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানো, বা সরকারের সমালোচনা করা থেকে শুরু করে বিস্তৃত অপরাধের অধীনে ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে আইনের যথেচ্ছ ও উদ্বেগজনক ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন সুশীল সমাজের সদস্য বিশেষ প্রতিবেদককে অবহিত করেছেন। যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয় এবং আটকে রাখা হয় তাদেরকে প্রায়ই দীর্ঘ সময়ের জন্য পুলিশ হেফাজতে থাকতে হয়, যতক্ষণ না উচ্চ আদালত জামিনের আদেশ জারি করে।

ডিএসএ-এর ধারা ৩২ "সরকারি গোপনীয়তা আইন" উল্লেখ করে, একজন ব্যক্তিকে "সরকারের গোপনীয়তা লঙ্ঘন" করার জন্য অনধিক ১৪ বছর মেয়াদের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা যেতে পারে। এই বিভাগটি সম্ভাব্য বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে, যা জনস্বার্থে কাজে দিতে পারে। এটি তথ্য অধিকার আইন (২০০৯) এর চেতনার পরিপন্থী। এটি ভয় এবং সেন্সরশিপের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৯ (৩) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

তার সফরের সময়, ভিন্নমতের কণ্ঠকে দমন করার একটি হাতিয়ার হিসেবে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর কার্যকারিতা সম্পর্কেও বিশেষ প্রতিবেদককে সতর্ক করা হয়েছে। ব্যুরোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নিবন্ধনমুক্ত করা, বিদেশী তহবিল লাইসেন্স বাতিল করা বা প্রকল্প অনুমোদন বা তহবিল বিলম্বিত করার অভিযোগ রয়েছে, যা সরকারবিরোধী বলে মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ প্রতিবেদককে "বিচার বহির্ভূত হত্যা এবং বলপূর্বক গুমের বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশের" কারণে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো কর্তৃক একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এই বাতিলাদেশ বহাল রেখেছে।

২. **বৈষম্য প্রতিরোধ এবং মোকাবিলা করা**

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যেমন সুশীল সমাজের কাজ করার জন্য সুযোগ প্রয়োজন, তেমনি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে সকল প্রকার বৈষম্য থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন।বাংলাদেশ অনেক ভাষাগত, জাতিগত, লিঙ্গ বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আবাসস্থল, যেমন দলিত, আদিবাসী, উর্দুভাষী বিহারী, বেদে (যাযাবর), হিজড়া এবং অন্যান্য।দেশটি তার বৈচিত্র্যের জন্য গর্বিত।

পরিদর্শনকালে, বিশেষ প্রতিবেদক কুড়িগ্রামের রবিদাস সম্প্রদায়ের (দলিত) সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করেন, তারা যে বৈষম্যের মুখোমুখি হয় তার বহুমুখী প্রকৃতির কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। রংপুরে তিনি ঘাটোয়ার, মুসোহর, পাহাড়ি ও তুরি সমভূমি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা করেন।

এই উভয় গোষ্ঠী পদ্ধতিগত বৈষম্যের সম্মুখীন হয়।বাংলাদেশে ৩.৫ থেকে ৬.৫ মিলিয়ন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে, যা মোট জনসংখ্যার ৩ থেকে ৪ শতাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে।প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের দ্বারা অবহেলিত এবং দলিত সম্প্রদায়কে 'অস্পৃশ্যতা', কলঙ্ক, সহিংসতা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো শোচনীয় অবস্থা সহ্য করতে হয়। ফলে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক সুরক্ষা, আবাসনের সুযোগপ্রাপ্তির অভাব হয়।বিশেষ প্রতিবেদককে জানানো হয়েছিল যে, সম্প্রদায়টির চাকরি প্রাপ্তির সুবিধা ও সীমিত।ঝাড় দেওয়া, পরিচ্ছন্নতা, শূকর পালন, দিনমজুর, কায়িক শ্রম,পরিচ্ছন্নতা বা মৃতদেহ দাফন ইত্যাদি পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ তাদের জীবন-জীবিকা। প্রভাবশালী জাতি ও শ্রেণী দ্বারা তারা কোনঠাসা।

২০২২ সালের শেষ আদমশুমারী অনুসারে জানা যায়, বাংলাদেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা ১,৬৫০,১৫৯। এই পরিসংখ্যান ও আদিবাসী এবং সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দ্বারা বিতর্কিত হয়েছে। শিক্ষা এবং অন্যান্য জীবিকার সম্ভাবনা কম থাকায় আদিবাসীদের মধ্যে বাল্য বিবাহ একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। যদিও সরকারের আদিবাসীদের জন্য সিভিল সার্ভিসে ৫%কোটা দেওয়ার নীতি রয়েছে। তবে এই কোটা শুধুমাত্র নিম্নস্তরের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দলিতদের মতোই অনেক আদিবাসী বয়স্ক ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী সরকারি ভাতা পান না, কারণ বাস্তবে এই জাতীয় প্রকল্পগুলোর

সুবিধা ভোগ করতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারপারসন বা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়।কিছু ক্ষেত্রে, কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য তাদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে ৪ থেকে ৮ হাজার টাকা ঘুষ দেওয়ার কথা ও শোনা যায়।

বিশেষ প্রতিবেদক উর্দু-ভাষাভাষী সংখ্যালঘু বিহারী জনগোষ্ঠীর সাথেও দেখা করেছেন। ২০০৮ সালে বিহারীদের বাংলাদেশে নাগরিকত্বের অধিকার দেওয়া হয়।তারা দেশের বিভিন্নস্থানে ১১৬টি "শিবিরে" বাস করে। উচ্ছেদের অবিরাম হুমকি তাদের নিত্যসঙ্গী।এবং প্রতিবেদক ধলপুরের তেলেগু কলোনির ২৩০টি পরিবারের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করেন, এবং জানতে পারেন,তাদেরকে ক্ষতিপূরণ বা পর্যাপ্ত স্থানান্তরের বিকল্প সরবরাহ না করেই বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। এতে ভূমি অধিগ্রহণ এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইনের (২০১৭) সুরক্ষা দেওয়ার সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয়।

যদিও দলিত, আদিবাসী এবং বিহারিরা দেশে বৈষম্যের শিকার একমাত্র গোষ্ঠী নয়, তারা বৈষম্যমূলক আচরণগুলো মোকাবেলা করার জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার গুরুত্ব তুলে ধরে। ২০২২ সালের এপ্রিলে সংসদে অনুমোদনের জন্য একটি 'বৈষম্য বিরোধী বিল' পেশ করা হয়েছিল। বিলটিকে আরও হালনাগাদ ও সময়োপযোগী করা যেতে পারে।এটি "অনগ্রসর সম্প্রদায়" বা ব্যক্তি কারা তা স্পষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করেনা এবং কারা এর সুফল পাবে তাও ব্যাখ্যা করেনা। এটি অস্পৃশ্যতার অনুশীলনকে বৈষম্যের একটি রূপ হিসাবে চিহ্নিত করে না।যদিও বিলের ধারা ৩ "তৃতীয় লিঙ্গ" এর বিরুদ্ধে বৈষম্যকে স্বীকৃতি দেয়, এটি হিজরা (ট্রান্সজেন্ডার) সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেনা, অথচ এরাও প্রান্তিক এবং চরম মাত্রার বৈষম্যের শিকার।এ বিল

বৈষম্যকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করেনা বা দলিত, আদিবাসী, বেদে, হিজরা এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি নির্দেশিত ঘৃণামূলক বক্তব্যকে অপরাধ বলে বিবেচনা করেনা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন, নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার কনভেনশন এবং আইএলও (নং১৬৯) আদিবাসী কনভেনশনসহ প্রাসঙ্গিক সার্বজনীন উপকরণগুলো সমন্বয় করে বিলটিকে উন্নত ও সময়োপযোগী করা যেতে পারে।

৩. **দেশীয় সম্পদের সক্রিয় ব্যবহার**

জনসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে দেশীয় সম্পদকে কাজে লাগানোর চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করা আরও কঠিন হবে যখন বাংলাদেশ এলডিসি অবস্থা থেকে উন্নীত হওয়ার পর বিদেশী বাজারে তার পছন্দ অনুযায়ী প্রবেশাধিকার হারাবে। দেশীয় সম্পদের বর্তমান পরিস্থিতিও নাজুক: কর ও জিডিপি বা গড় মাথাপিছু আয়-এর অনুপাত নিম্ন ৭.৮%, ব্যাংকিং খাতে অ-পারফর্মিং বা ক্রিয়াশীল নয় এমন সম্পদের হার বেশি (২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮.২%), বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পাচ্ছে (ইউএসডি ১০.৫ বিলিয়ন) ২২শে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত, এবং ক্রমবর্ধমান ঋণ পরিসেবা (বিডিটি শর্তে): ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ (সরকারি এবং বেসরকারী উভয়) প্রায় ৯৬.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়েছে, এবং বিনিময় হারের সাম্প্রতিক পতন এটিকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলেছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদানের জন্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর নির্বাহী বোর্ড বাংলাদেশের জন্য স্থিতিস্থাপকতা ও টেকসই সুবিধার অধীনে ৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বর্ধিত ক্রেডিট সুবিধা এবং বর্ধিত তহবিল সুবিধা ব্যবস্থা এবং

১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করেছে।তবে এটি কেবল সাময়িক স্বস্তি আনবে।

বিশেষ প্রতিবেদক তিনটি অগ্রাধিকারের উপর জোর দেন।প্রথমত, বাংলাদেশের উচিত একটি উদার করব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে তার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহকে শক্তিশালী করা।সংগৃহীত রাজস্বের ৬৫-৬৯ শতাংশ থেকে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) পরোক্ষ করের অংশ বেশি রয়েছে। ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের আলোকে পরোক্ষ করের উপর বাংলাদেশের অত্যধিক নির্ভরতাকে অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং প্রত্যক্ষ করের জন্য মঞ্জুরি দেয় এমন করের ভিত্তি প্রসারিত করতে হবে।দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রদত্ত কর প্রণোদনাগুলোকে একটি নিয়মিত ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ পরিচালনা করে তাদের যথেচ্ছ ব্যবহার এড়াতে হবে।তৃতীয়ত, বাণিজ্য ও কাস্টমস মিসইনভয়েসিংয়ের বা ভুল-চালান ইস্যুর মাধ্যমে হারানো রাজস্ব ফিরে পেতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।২০০৮ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে, আমদানি ও রপ্তানির ঘোষিত মূল্যের ভুল মূল্য নির্ধারণের ফলে বাংলাদেশ গড়ে ৮.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব হারিয়েছে।

IV. স্বল্প-উন্নত দেশের (এলডিসি) অবস্থা থেকে উন্নীতের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জসমূহ

২০২৬ সালে বাংলাদেশ এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে উন্নীত হবে।যদিও এই ধরনের উন্নীতকরণ স্বাধীনতার পর থেকে অর্জিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ধারাবাহিকতা, এবং কিছু বাণিজ্যকে ক্ষতির দিকেও পরিচালিত করবে। তবে এ ক্ষতির কিয়দংশ আংশিকভাবে পূরণ হবে সম্প্রতি হওয়া ভুটান এবং শ্রীলঙ্কার সাথে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে।দেশটি শুধুমাত্র খরচ-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেনা, এর পরিবর্তে এটির রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে হবে, আরও যোগ্য কর্মশক্তিতে বিনিয়োগ করে এবং

উন্নত স্বাস্থ্যসুবিধা ও শিক্ষাসুবিধা সরবরাহের মাধ্যমে মানবপুঁজি বা সম্পদ তৈরি করে রপ্তানির চেয়ে দেশীয় চাহিদা ও ব্যবসাকে শক্তিশালী করতে হবে। ক্রমবর্ধমান রপ্তানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদা জোরদার করতে হবে। এসবের জন্য সামাজিক সুরক্ষায় বিনিয়োগ প্রয়োজন।বিশেষ প্রতিবেদক ক্রমানুসারে এই বিষয়গুলো তুলে ধরবেন:

১. **শ্রমিকদের অধিকার**

বিশেষ প্রতিবেদক অনানুষ্ঠানিক কর্মীসহ ইউনিয়ন ও কর্মীদের সাথে দেখা করেন।অনানুষ্ঠানিক কর্মীরা কর্মশক্তির শতকরা ৮৫ ভাগ এবং বেশিরভাগই নারী। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন (বিএলএ) এই শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেনা। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় কাজ করার সময়, এই শ্রমিকরা বিশেষভাবে অপব্যবহার ও অবমাননার শিকার হয়। কিছু রাস্তার শ্রমিক স্থানীয় গুন্ডা এবং পুলিশ দ্বারা হয়রানির শিকার হয়।তাদের জন্য বিদ্যমান কোনো কল্যাণমূলক প্রকল্প বা আইনি সহায়তা সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানেন না। যদিও নীচে উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি দুর্বল কর্মীদের অন্যান্য হয়রানিমূলক বিষয়ের উপর জোর প্রদান করে, অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তর এবং অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান এবং অনানুষ্ঠানিক কর্মীদের কাজের সময়ের ক্ষেত্রে বিএলএ-এর নিয়মগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। .

তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত

তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮২ ভাগ অর্জন করে এবং ২০২২ সালে ৪ মিলিয়নেরও বেশি কর্মী নিয়োগ করেছে এ খাত। এই খাতের সাফল্য অর্থনীতির অন্যান্য খাতকে অনুপ্রাণিত করতে পারে কারণ দেশটি তার রপ্তানি বহুমুখী করতে চায়। তবুও, এই সাফল্য শ্রমিকদের অধিকার, বিশেষ করে

ন্যায্য পারিশ্রমিকের অধিকার এবং ইউনিয়নের অধিকারের কথা যথাক্রমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির (সিইএসসিআর) ৭ এবং ৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। মজুরি দমন করা এবং শ্রমিকদের অধিকার সীমাবদ্ধ করার উপর ভিত্তি করে একটি রপ্তানি কৌশল ব্যর্থ হতেবাধ্য, কারণ বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান চেইনগুলোকে আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ক্রেতাদের বিশ্বব্যাপী সরবরাহকৃত চেইনে যথাযথ মনোযোগ প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করাহয়।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা হল এমন একটি বিষয় যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে৷ রানা প্লাজা বিপর্যয়ে ১,১৩৮ জন শ্রমিক প্রাণ হারায় এবং ২,৫০০ জন আহত হয়। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো (প্রাথমিকভাবেই উরোপীয়) স্থানীয় নিয়োগকর্তা এবং গ্লোবাল ইউনিয়ন-এর সাথে বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি-এর অধীনে যোগ দিয়েছে; এটি একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি যা ব্র্যান্ডগুলোকে প্রতিশ্রুতি দেয়। অ্যাকর্ডের নিরাপত্তা মানপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারের জন্য অর্থায়ন করা এ চুক্তির আওতাধীন। এটি এখন আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিলের (আরএসসি) তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে স্থাপিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে পরিণত হয়েছে।অ্যাকর্ডের ফলস্বরূপ, কারখানা ভবনগুলোর কাঠামো শক্তিশালী হয়েছে। ফায়ার ডোর এবং ফায়ার অ্যালার্ম স্থাপন করা হয়েছে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিরাপদ কাজ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার এবং অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে কীভাবে ভবন খালি করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। অত্যধিক কর্মঘণ্টা এবং অযাচিত হয়রানির সমাধান করা হয়েছে, এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে অভিযোগের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।অ্যাকর্ডের অধীনে, হাজার হাজার পরিদর্শন পরিচালিত হয়েছে।

একইভাবে, অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমেরিকান ব্র্যান্ডগুলির নেতৃত্বে একটি বাধ্যতামূলক উদ্যোগ হিসাবে, যা পরিদর্শন এবং প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছিল।এছাড়াও, আরএমজি সেক্টরের ৪৩৭টি কারখানা (মোট ১২৫০০০০ এরও বেশি কর্মী নিযুক্ত – আরএমজি সেক্টরের মোট কর্মীর এক চতুর্থাংশেরও বেশি) এখন বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ প্রোগ্রামের আওতায় রয়েছে।আইএলও এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ) যৌথভাবে এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছে।প্রোগ্রামটি পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক এবং গার্হস্থ্যশ্রম-মানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করতে অঘোষিত পরিদর্শনের অনুমতি দেয়।

যদিও এই ধরনের উদ্যোগসমূহকে বাংলাদেশের শ্রমপরিদর্শকদের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধিসহ শ্রম আইন কিছু বাস্তবসম্মত উন্নয়ন ঘটিয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘাটতি ও বিদ্যমান।আইএলও-আইএফসি বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামের কার্যকারিতা সীমিত, যেহেতু মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলো পরিদর্শন সাপেক্ষে কারখানার ব্যবস্থাপনা বিভাগকে দেখানো হয়, কিন্তু শ্রমিক প্রতিনিধিদের দেখানো হয়না।আন্তর্জাতিক চুক্তির বিষয়ে, কিছু বড় আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড যোগদান করেনি, কারণ তারা সরবরাহকারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থপ্রদান করতে ইচ্ছুক নয়, কারণ তারা বড় সরবরাহকারী যারা নিয়ম মেনে পণ্য সরবরাহ করে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যেমন- জেসি, পেনি, গ্যাপ, ওয়ালমার্ট, টিম্বারল্যান্ড, এবারক্রম্বি, এবং ফিচ।এছাড়াও RSC-এর আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সদস্যপদ রয়েছে, যার ফলে পরবর্তী গোষ্ঠীকে পদ্ধতিগতভাবে একটি সংখ্যালঘু অবস্থানে রাখা হয়েছে: ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নকে

নিয়ে আরএসসি-কে একটি বহুমুখী সংস্থায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। .

আরএসসি-কে শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে দাম নির্ধারণের জন্য মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কেবল মনে রাখতে হবে, ইউনিয়ন অধিকার যেন খর্ব না হয়।এটি একটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। ২০২২ আইটিইউসি গ্লোবাল রাইটস ইনডেক্স অনুসারে, কর্মীদের জন্য সবচেয়ে খারাপ দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। ২০১৬ সালে, শ্রমিকদের বিক্ষোভ, বিশেষ করে,উচ্চ মজুরি, ওভারটাইম বা বাড়তি সময় কাজের জন্য অর্থ প্রদানের দাবিতে দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়েছিল, যা শ্রমিকদের সংগঠন এবং তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর একটি নীরব প্রভাব ফেলেছিল।তার সফরের সময়, বিশেষ প্রতিবেদক বিভিন্ন উত্স থেকে শুনেছেন যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর নিবন্ধন গুরুত্বপূর্ণ বাধার সম্মুখীন হয়েছে: যখন ২০১০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ১১০০টিরও বেশি ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন করে, শতকরা ৪৬ ভাগ প্রত্যাখ্যান করা হয়।ইউনিয়ন অধিকার বারবার লঙ্ঘনের কারণে আইটিইউসি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অভিযোগ দায়ের করে। কাজের অবস্থার তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিশনের আহ্বান জানায়। এটি বাংলাদেশ সরকারকে ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য, অন্যায্য শ্রম অনুশীলন, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং উন্নত মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করার জন্য ইউনিয়নের সাথে পরামর্শ করে একটি রোডম্যাপ তৈরি করতে আহবান করে।

প্রকৃতপক্ষে, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকর্ড এবং আইএলও-আইএফসি বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামের মতো উদ্যোগগুলোর দুর্বলতা হলো, বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশ তার ব্যয়-প্রতিযোগিতা বজায় রাখার

জন্য স্বল্প মজুরি প্রদানের যে পছন্দ বেছে নিয়েছে তা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলতে পারেনা।

সিইএসসিআর-এর অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীনে, সকল শ্রমিকের একটি পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যা তাদের ন্যূনতম ন্যায্য মজুরি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাদের পরিবারের জন্য একটি উপযুক্ত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করবে।ফলে মজুরির হার "বহির্গত কারণ যেমন জীবনযাত্রার ব্যয় এবং অন্যান্য বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত করা প্রয়োজন।এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, একজন শ্রমিক ও তার পরিবার মজুরি দিয়ে মৌলিক অধিকারগুলো উপভোগ করতে পারবে। যেমন-সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান--খাদ্য, পানি এবং স্যানিটেশন, বাসস্থান, পোশাক এবং যাতায়াতের খরচের মতো অতিরিক্ত খরচ ইত্যাদি অধিকার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, শ্রমিকদের ন্যূনতম ভাবে, একটি "জীবনধারনের উপযুক্ত মজুরি" প্রদান করা উচিত। তবে, বাংলাদেশে ইউনিয়ন অধিকারের (সমষ্টিগত দরকষাকষির অধিকারসহ) নিশ্চয়তা না থাকায় ইউনিয়নগুলো পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম নয়, এবং মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির স্তর বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক বাজার দরের নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি ৮,০০০ টাকা ধরে তৈরি পোশাক শিল্পের ন্যূনতম মজুরি সর্বশেষ পুনঃনির্ধারণ করা হয় ২০১৮ সালে। যদিও টাকার অংকে এই মজুরি বৃদ্ধি ছিল ২০০৬ সালের তুলনায় ৩৮০% বেশি, তবে প্রকৃতপক্ষে এই বৃদ্ধি ছিল প্রায় ১৫৭% (যেহেতু সেই সময়ের মধ্যে সম্মিলিত মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৮৬,৬৪%)। এই বৃদ্ধি তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মান নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপকভাবে অপ্রতুল বলেই প্রতীয়মান হয়। শ্রমিক

ইউনিয়নগুলোর নূন্যতম মজুরির দাবি ২৩,০০০ টাকা, ৬৩টি কারখানার ৩০০ জন তৈরি পোশাক শ্রমিকের আয় ও ব্যয়ের ধরনের ওপর ভিত্তি করে চালানো এক সমীক্ষা, এবং এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্সের হিসেব অনুযায়ী একটি পরিবার চালানোর জন্য বাংলাদেশের একজন কর্মজীবী ব্যক্তির মাসে কমপক্ষে ৫১,৯৯৪.৫১ টাকা আয় করা উচিত। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি থেকে কার্যকরভাবে সুরক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণও খুব অনিয়মিত। সেই সাথে "নন-কমপ্লায়েন্ট" কারখানাগুলো – প্রায় ৩,৫০০টি ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা প্রধানত "কমপ্লায়েন্ট" কারখানাগুলো থেকে ঠিকাদারি চুক্তিতে কাজ নেয় – মজুরি পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারটি নিয়মিতভাবে উপেক্ষা করে।

আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ক্রেতারা এই অবস্থার জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী। তাদের ক্রয়নীতি ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশে কারখানার মালিকদের ধারাবাহিকভাবে খরচ কমাতে, বিশেষত শ্রমিকদের মজুরি কমিয়ে বা নিম্নমানের কর্ম পরিবেশের সাব-কন্ট্রাক্টরদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। সর্বশেষ করোনা অতিমারীর সময় এই বিষয়টি সামনে আসে। অতিমারী শুরু হওয়ার পরপরই ব্র্যান্ডগুলো হয় তাদের ক্রয়াদেশ বাতিল করেছে অথবা উত্পাদিত পণ্যের বিপরীতে অর্থ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যার ফলে কারখানার মালিকরা তাদের শ্রমিকদের বেতন দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধুমাত্র ২০২০ সালের মার্চ মাসে ১৫০টি কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং আনুমানিক ১৪৭,০০০ জন শ্রমিক তাদের সেই মাসের মজুরি পাননি। ফলশ্রুতিতে শ্রমিকদের মজুরি ও ছাটাই সংক্রান্ত দেনাপাওনা পরিশোধ না করার ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতিমারীর প্রথম ১৩ মাসে তৈরি পোশাক শ্রমিকরা ১১.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের আয় হারিয়েছেন।

এই ধরণের অনিয়মের ঘটনা নতুন কিছু নয়। সরবরাহকারীদের নিয়ে ২০১৬ সালে আইএলও বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিশ্বব্যাপী এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে সরবরাহকারীরা ক্রেতাদের জন্য অযৌক্তিক ছাড় দিতে বাধ্য হচ্ছে। সে সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৫২% সরবরাহকারী (বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে) জানিয়েছেন যে তারা ক্রেতার চাপের কারণে উৎপাদন খরচের চেয়েও কমে ক্রয়াদেশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালে হিউমেন রাইটস ওয়াচের অন্য একটি প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে ক্রেতারা সরবরাহকারীদের উপর দাম কমাতে বা দ্রুত উৎপাদন করতে বিভিন্ন ধরনের চাপ প্রয়োগ করে। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে পণ্য উৎপাদনের জন্য কম ক্রয়মূল্য এবং কম উৎপাদন সময়, ক্রয়াদেশের প্রয়োজনীয় বিবরণ, অনুমোদন প্রদানে বিলম্ব বা ক্রয়াদেশে আকস্মিক পরিবর্তন, সরবরাহকারীদের ওপর অন্যায্য জরিমানা আরোপ এবং অর্থ প্রদানের দুর্বল শর্ত সরবরাহকারীদের জন্য মজুরি বৃদ্ধি বা ওভারটাইম প্রদান কঠিন করে তোলে। “অনেক ব্র্যান্ড তাদের সরবরাহকারীদের সম্মানজনক কর্মক্ষেত্র বজায় রাখার ওপর জোর দেয়,” প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, “কিন্তু তারপর তাদের উল্টোটা করতে উৎসাহিত করে।” সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা গভর্নমেন্ট অফিস অফ টেক্সটাইল অ্যাপারেল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিগুলির মধ্যে দশটি বিশ্লেষণ এবং সেগুলোর ফ্রি-অন-বোর্ড (এফওবি) দামের সাথে বড়

প্রতিযোগীগুলির দাম তুলনা করে দেখা যায় যে বাংলাদেশে সরবরাহকারীদের (সাথে অন্যান্য দেশে তাদের প্রতিযোগীদের) ক্রমাগতভাবে বিশ্ব গড় মূল্যের কম অর্থ প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশী তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে পুরুষদের সুতির ট্রাউজার্সের জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, তা গড় বিশ্ব মূল্যের চেয়ে ৯.২% কম। পুরুষদের সুতির জিন্সের জন্য এই মূল্য ৭.২%, মহিলাদের সুতির জিন্সের জন্য ১৪%, এবং পুরুষদের বোনা সুতির শার্টের জন্য ২৬.৫% কম।

বিশেষ প্রতিবেদক এইসব গবেষণা থেকে তিনটি উপসংহারে পৌছান। প্রথমটি হলো, বাংলাদেশী তৈরি পোশাক সরবরাহকারীদের তাদের ক্রেতাদের কাছে উচ্চ মূল্য নেওয়ার এবং মজুরি আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, এই বিবেচনায় যে শ্রমের যে মূল্য তাদের দেওয়া হচ্ছে তা এফওবি দামের একটি ছোট অংশ। যা কিনা শেষ পর্যন্ত ভোক্তা প্রদত্ত মূল্যের একটি ছোট ভগ্নাংশে দাঁড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় উপসংহারটি হল যে, তারা কার্যকরভাবে এটি তখনই করতে সক্ষম হবে, যখন তারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির অধিকার এবং অনুকূল কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে পারবে, এবং যখন এসবের জন্য ক্রেতাদের দায়ী করা হবে এবং তাদের ক্রয় পদ্ধতি আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। ব্যবসা এবং মানবাধিকারের বিষয়ে জাতিসংঘের নির্দেশিকা নীতি অনুসারে ব্যবসা "অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন এড়াতে এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোয় প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য যথাযথভাবে কাজ করবে"। এর প্রয়োজনীয়তা জাতিসংঘের চরম দারিদ্র্য এবং মানবাধিকার বিষয়ক

নীতিগুলি দ্বারাও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। সরবরাহকারীরা যাতে যথাযথ মজুরি প্রদান করে এবং তাদের কর্মীদের কাজের ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা নিশ্চিত করে, সেজন্য ক্রেতাদের উচিত তাদের ক্রয় পদ্ধতির প্রভাব মূল্যায়ন করা। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিউ ডিলিজেন্স গাইডেন্স ফর রেসপন্সিবল সাপ্লাই চেইন ইন দ্য গার্মেন্টস অ্যান্ড ফুটওয়্যার সেক্টরের সুপারিশ অনুযায়ী, একটি কোম্পানির উচিত বেশকিছু সূচকের মাধ্যমে তার ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা। উদাহরণস্বরূপ, এসব সূচকের মধ্যে আছে "দেরিতে দেওয়া ক্রয়াদেশের শতাংশ, ক্রয়াদেশ প্রদানের পর পরিবর্তনের শতাংশ, শেষ পরিবর্তন এবং পণ্য গ্রহণের মধ্যে অতিবাহিত দিনের সংখ্যা"। এই শর্তগুলো যথাযথ ও কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে ব্র্যান্ডগুলোকে তাদের স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিয়মিতভাবে সরবরাহকারী কারখানার নাম এবং অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। ব্র্যান্ডগুলোর উচিত তাদের সরবরাহকারীদের সাব-কন্ট্রাক্টরদের বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে অনুরোধ করা এবং সেই তথ্য প্রকাশ করা: অন্যথায় সরবরাহকারীরা সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে, যেখানে ক্রেতারা এই ধরনের অভ্যাসগুলো দেখেও না দেখার ভান করে যতক্ষন পর্যন্ত দাম কম রাখা হয়।

তৃতীয় এবং পরিশেষে, বাংলাদেশ সরকার গার্মেন্টস সেক্টরের পাশাপাশি অন্যান্য খাতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করে একটি আরও ব্যাপক ন্যূনতম মজুরি নীতির মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলিকে সমর্থন করতে পারে। এই সরকারি নীতি সরবরাহকারীদের খরচ কমিয়ে

শ্রমিকদের মজুরি এবং কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য একে অপরের প্রচেষ্টাকে হ্রাস করার পরিবর্তে সমর্থন করবে সরবরাহকারীদের শীর্ষে যাওয়ার প্রতিযোগীতাকে।

বাংলাদেশ তার স্বল্প বেতনের ফাঁদ এড়াতে পারে এবং তাকে অবশ্যই এটি এড়াতে হবে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনা এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোর একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

বাংলাদেশে বর্তমানে আটটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) রয়েছে। ইপিজেডগুলো মূলত ১৯৮৪ সালে চালু করা হয়েছিল। এগুলোতে বর্তমানে ৪৫২টি বিদেশী রপ্তানিকারকের বিনিয়োগ রয়েছে এবং সেখানে আনুমানিক মোট ৪৮৬,০০০ জন কর্মী কাজ করে। দেশটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এসইজেড) সংখ্যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাড়িয়ে মোট ৯৭টি করার চেষ্টা করছে। এই এসইজেডগুলোর নির্দিষ্ট কিছু দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বরাদ্দকৃত এলাকাটি একটি বেসরকারী বিনিয়োগকারীর সাথে তৈরি করা হয়েছে। অবশেষে, চারটি ইলেকট্রনিক হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মোট নয়টি কোম্পানি রয়েছে।

বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার এই কৌশলগুলোর অবশ্য কিছু সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ইপিজেডের মধ্যে পরিচালিত কোম্পানিগুলিকে বাংলাদেশ শ্রম আইন (বিএলএ) ২০০৬ থেকে অব্যাহতি দেওয়া

হয়েছে। এর পরিবর্তে, তারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল শ্রম আইন ২০১৯ দ্বারা পরিচালিত হয়, যাতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা এর সদস্যপদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। এটি আইএলও কনভেনশন নাম্বার ৮৭ (ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড প্রটেকশন অফ দ্য রাইট টু অর্গানাইজ) এবং আইএলও কনভেনশন নাম্বার ৯৮ (সংগঠিত করার অধিকার এবং সম্মিলিত দর কষাকষির অধিকার) লঙ্ঘন, যদিও উভয়ই বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক। ইপিজেড কর্মীদের শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন ও প্রতিষ্ঠা করার মতো কিছু সীমিত অধিকার রয়েছে, তবে এই সমিতিগুলিকে বেসরকারী সংস্থাসমূহ, যারা শ্রমিকদের অধিকার সমর্থন করতে পারে, তাদের সাথে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।

এর বিপরীতক্রমে, বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রযোজ্য। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলো (যা বিদেশী বা দেশীয় উভয়-ই হতে পারে) বেশকিছু কর সুবিধা ভোগ করে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক তিন বছর কর্পোরেট আয়কর থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি (এবং একটি আংশিক ছাড়, যা চতুর্থ থেকে দশম বছর পর্যন্ত ২০% থেকে ৮০% পর্যন্ত), দশ বছর লভ্যাংশ কর এবং মূলধন লাভ কর সম্পূর্ন অব্যাহতি, গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং পানির উপর ভ্যাট শতভাগ অব্যাহতি, রয়্যালটি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি এর উপর শতভাগ আয়কর ছাড় এবং অন্যান্য। এছাড়াও, ঘোষিত লভ্যাংশ এবং বিক্রয় থেকে আয় সীমা ছাড়াই ফেরত আনা যায়।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে দেওয়া এসব সুবিধা ও প্রণোদনাগুলো নিয়ে মোটাদাগে ওঠা প্রশ্নটি হলো,

এইসব অঞ্চলগুলো আদৌ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটির অনুচ্ছেদ ২(১) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাপ্তিসাধ্য সম্পদের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো আদায় নিশ্চিত করে কি না। এসব অঞ্চলের লক্ষ্য হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি করা। কিন্তু এই অঞ্চলগুলোতে সরকারী রাজস্বের ক্ষতি উল্লেখযোগ্য, এবং স্থানীয় অর্থনীতির সাথে সংযোগের উল্লেখযোগ্য সুযোগগুলো এখানে হাতছাড়া করা হয়েছে।

অভিবাসী শ্রমিক

বাংলাদেশ যেমন পোশাক রপ্তানি করে, দেশটি তেমন শ্রমিকও রপ্তানি করে থাকে। শুধুমাত্র ২০২২ সালে, ১.১ মিলিয়ন বাংলাদেশি দেশ ছেড়েছেন যার বেশিরভাগের গন্তব্য ছিল উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিল বা জিসিসি দেশগুলোয়। রেমিট্যান্স প্রবাহ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ: ২০২২ সালে ২২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রেমিটেন্স দেশে এসেছে, যা ছিল জাতীয় জিডিপির ৬.২%। এই অভিবাসী শ্রমিকদের বেশিরভাগই নিম্ন-আয়ের পরিবার থেকে উঠে আসা, এবং সহজেই মধ্যস্থতাকারী নিয়োগকারী বা "দালালদের" অপব্যবহারের শিকার হয়। এইসব দালালরা কখনও কখনও অভিবাসীদের মিথ্যা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিছু অভিবাসী গন্তব্যের দেশে পৌঁছানোর পরে আবিষ্কার করেছিল যে তাদের কোনও কাজ দেওয়া হয়নি, বা তাদের প্রকৃতপক্ষে নিচুমানের শ্রম বা পতিতালয়ে ঠাই হয়েছিল। যদিও দেশ থেকে তাদের বিনোদন খাতে কাজের লোভ দেখিয়ে দেশের বাইরে নেওয়া হয়েছিল।

বিশেষ প্রতিবেদক এক্ষেত্রে দুইটি সুপারিশ করেন। প্রথমত, কর্মী সংগ্রহকারী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, বিশেষ করে নিশ্চিত করা যে কর্মীদের গন্তব্যের দেশগুলিতে কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত করা হয়েছে। এবং ভিসাসহ গন্তব্য দেশে ভ্রমণ করার পর শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্মসংস্থান প্রদান না করা হলে তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয়ত, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি (যেমন, জর্ডান বা সৌদি আরবের সাথে) যদি অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষার উন্নতির জন্য হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যে কোনও নতুন চুক্তি বা বিদ্যমান চুক্তির নবায়নের ক্ষেত্রে এই শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যে, গন্তব্যের দেশটি সকল অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষায় ১৯৯০ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং ২০১১ সালের আইএলও গৃহকর্মী কনভেনশন (নাম্বার ১৮৯) অনুমোদন করে এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে; এবং যেন গন্তব্যের দেশে একটি নির্দিষ্ট নিয়োগকর্তার সাথে কর্মীকে নিয়োগ করার কেফালা পদ্ধতি বাতিল করে।

২. শিক্ষা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার বেশি, এর কারণ বিনামূল্যে সরকারি শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান। শিশুরা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়গুলি অতিক্রম করার সাথে সাথে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়, এবং নিম্ন-আয়ের পরিবার থেকে উঠে আসা শিশুরা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়: ১৯% শিশু (এবং ৪৫%

দরিদ্রতম শিশু) স্কুলে পৌঁছানোর সময় পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে স্কুল থেকে বাদ। এই পরিসংখ্যানগুলো অবশ্য শিক্ষার মান সম্পর্কে ধারণা দেয়া না: নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ নাগাদ মাত্র ৫৪% মেয়ে এবং ৫৫% ছেলে বাংলা পড়ার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করে।

বিশেষ প্রতিবেদক যে পরিবারগুলো সাথে কথা বলেছেন, তাদের বেশিরভাগই শিশুদের বেসরকারি স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, যেহেতু সরকারি স্কুলগুলো নিম্নমানের। এই ব্যবধানের ফলস্বরূপ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়: যারা বেসরকারি স্কুলের খরচ বহন করতে পারে না (এমনকি যেখানে ফি কম), শুধুমাত্র তারাই পাবলিক স্কুলে থেকে যায়। কিছু স্কুল আছে যারা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয় (এবং একটি ফি নেওয়া হয়), কিন্তু শিক্ষকদের মাসিক বেতনের একটি অংশ সরকার দ্বারা ভর্তুকি দেওয়া হয়। এগুলো রাষ্ট্রের তহবিল ব্যয় করে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি অংশ।

দারিদ্র্য, স্কুলে পড়ার সামর্থ্য এবং মান এবং যে প্রেক্ষাপটে শিশুরা বড় হচ্ছে তা নির্ধারণ করে যে শিশুরা কতদিন স্কুলে থাকবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা বিশেষ প্রতিনিধিকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দারিদ্র্যের কারণে কীভাবে বাল্যবিবাহ এবং শ্রমের জন্য শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে: শিশুরা বড় হওয়ার সাথে সাথে স্কুলে পড়ার প্রত্যক্ষ এবং সুযোগ ব্যয় পরিচালনা করা পরিবারের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে ৩৮ মিলিয়ন বাল্যবধূ রয়েছে, যাদের মধ্যে ৩২.৪% এর ১৫ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়েছিল; ৫১.৪% বাংলাদেশী মেয়েদের

১৮ বছরের মধ্যে এবং ১৫.৫% এর ১৫ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। এদের স্বাস্থ্য, সুযোগ এবং সুস্থতার ওপর গুরুতর প্রভাব রয়েছে। বিশেষ প্রতিবেদক অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসকারী লোকদের সাথে দেখা করেন যারা ছেলেদের স্কুলে পাঠানোর খরচ বহন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল এবং যাদের শিশুশ্রমের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজনীতা ছিল। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মতো অনেক শিল্পে শিশু শ্রম এখনো রয়ে গেছে এবং বিষয়টি শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থঝুঁকির উদ্বেগ তৈরি করেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি শিশুদের দীর্ঘ সময়ের জন্য স্কুলে রাখতে সাহায্য করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, কিন্তু এটি স্পষ্টতই তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নত করা এবং শিক্ষার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, পাশাপাশি বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা উচিত।

৩. স্বাস্থ্যসেবা

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হার ২০০০ সালে প্রতি ১০০,০০০ জীবিত প্রসবে ৪৪৭ জনে দাঁড়িয়েছে; ২০২০ সালে এই হার ছিল ১৬৩ জন। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপুষ্টির হার ছিল ৪৫%; ২০১৯ সালে তা কমিয়ে ২৮% এ আনা সম্ভব হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী মৃত্যুহার অর্ধেক হয়ে গেছে (প্রতি ১,০০০ জীবিত প্রসবে ৭৬ থেকে ৩৮)। বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ এলাকায় মৌলিক

স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা উন্নত করতে ১৩,০০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করেছে।

স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো তবুও তাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় মেটাতে এখনও লড়াই করে যাচ্ছে: উদাহরণস্বরূপ ঢাকার অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসকারীরা অসুস্থতাকে তাদের পরিবারের খরচের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ব্যয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন (ভাড়া এবং খাবারের পরে), স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় ঋণ এবং পরিবারের অর্থনীতির ওপর বিপর্যয়কর প্রভাবের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি খরচের বাইরে স্বাস্থ্য ব্যয় ২০০০ সালের ৬১.৮% থেকে ২০২০ সালে বেড়ে ৭৪% এ দাঁড়িয়েছে, যা আংশিকভাবে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা অভিজাত বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবহার প্রতিফলিত করে। তবে এর আরো একটি ইঙ্গিত হলো ক্রমবর্ধমান দ্বৈত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা – ধনীদের জন্য ব্যয়বহুল এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা এবং দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে কিন্তু নিম্নমানের স্বাস্থ্যসেবা।

শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানোর পাশাপাশি গুচ্ছ চিকিৎসা পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, এর জন্য সরকারি সেবা ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার। প্রসবের সময় স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিনামূল্যে হলেও, বিশেষ প্রতিবেদক শহুরে এলাকার দারিদ্র্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে মেডিক্যাল ক্লিনিকের পরিবর্তে ফার্মেসিতে যাওয়ার উদাহরণ শুনেছেন। কারণ তারা কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকতে বা পরিবহনের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে না। তিনি হাসপাতালে মধ্যস্বত্বভোগীদের কথাও শুনেছেন যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাই তিনি শহরাঞ্চলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার পরিকল্পিত সম্প্রসারণের বিষয়ে

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও পরিবার বিভাগের সাথে কথা বলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

৪. সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার বর্তমানে বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে তা বেমানান ১১৯টি সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে, যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে পড়ে। কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সমন্বয় দুর্বল: উদাহরণস্বরূপ, কোনও একক পারিবারিক রেজিস্ট্রি নেই, যাতে সুবিধাভোগীদের অনেকগুলি তথ্যভান্ডার পাশাপাশি অবস্থান করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা অপ্রতুল, সুরক্ষা অপর্যাপ্ত। কার্যক্রমগুলোর ব্যপ্তি অত্যন্ত অসম, এবং লক্ষ্যবস্তু সাধারণত দুর্বল, যেখানে অন্তর্ভুক্তি থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে জরুরী সংস্কার প্রয়োজন এবং যেখানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি আশা করা যেতে পারে, যেমনটি ২০১৫ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এবং পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২০২৬ উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর মাধ্যমে সংস্কারের সূচনা হওয়া উচিত। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বাজেট বরাদ্দ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২০/২১ সালের মধ্যে জিডিপির ৩.০% বা ১৬.৮% এ পৌঁছেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ বরাদ্দ এখনও কম। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যাপ্তি জনসংখ্যার প্রায় ২৮.৭%। আইএমএফের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ সরকার এ কথা স্বীকার করেছে। তদুপরি, এ খাতে খরচ জনসংখ্যার চাহিদার সাথে ত্রুটিপূর্নভাবে সংযুক্ত: পুরো বাজেটের

৩৬% জনসংখ্যার মাত্র ০.৪৫% জন্য, সিংহভাগ সরকারি কর্মচারীদের পেনশনে যাচ্ছে (যা ২০১৯/২০ বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সম্মিলিত বরাদ্দের চেয়েও বেশি)। এর বিপরীতে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা জনসংখ্যার ৯% এবং তাদের ১৩% দারিদ্র্যের মধ্যে, অথচ তারা বাজেটের মাত্র ২% পায়। পরিশেষে, যখন সরকার একটি লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন অনুশীলন করছে, প্রভাবগুলি শেষপর্যন্ত কী হয় তা দেখা বাকি রয়েছে।

সরকার এই সমস্যাগুলির অনেকগুলি স্বীকার করে। এবং প্রতিশ্রুতির সংকেতও আছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মধ্যে ছোট বাচ্চাদের জন্য একটি শিশু সুবিধার প্রস্তাব রয়েছে। বেসামরিক কর্মচারীদের ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পেনশন অধিকার প্রসারিত করার জন্য সম্প্রতি আইন পাস করা হয়েছে। গভর্নমেন্ট টু পার্সন (জিটুপি) সিস্টেম, যার লক্ষ্য ইলেকট্রনিক পেমেন্ট নিশ্চিত করার মাধ্যমে বৃদ্ধ ভাতা এবং বিধবা ও নিঃস্ব মহিলা ভাতার মতো কর্মসূচিতে কাজ করা।

দারিদ্র্য দূরীকরণে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে, সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয়ের মাত্রা বাড়াতে হবে, সামাজিক সুরক্ষা ফ্লোর প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জীবন-চক্র পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত (মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং শিশু ভাতা থেকে বার্ধক্য পেনশন পর্যন্ত জীবনের প্রধান ঝুঁকিগুলি সামলানো), এবং এর সুরক্ষা ব্যাপ্তি দরিদ্রতম গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অবশ্যই উন্নতি করতে হবে: শিশুদের, শহুরে এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের শিকারদের অগ্রাধিকার দিতে হবে – নীচে আরও বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেভাবে এটির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সামাজিক

সুরক্ষাকে কেবল ব্যয় হিসাবে দেখা উচিত নয়। এটি পরিবারের স্থিতিস্থাপকতাকে শক্তিশালী করে, অর্থনীতিকে আকস্মিক সঙ্কটগুলোকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে সম্ভাব্য উচ্চমাত্রার সুবিধাসহ বাংলাদেশি জনসংখ্যায় একটি বিনিয়োগও বটে।

যদিও, একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল বরাদ্দের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের বিবেচনামূলক ক্ষমতা হ্রাস করা, যা বর্তমানে ভুলভাবে লক্ষ্য স্থির করা এবং বৈষম্যের একটি প্রধান উত্স। বিশেষ প্রতিবেদক এমন অসংখ্য পরিবারের সাথে দেখা করেছেন যারা দুস্থ খাদ্যসহায়তা এবং দুস্থদের জন্য কর্মসংস্থানের মতো কর্মসূচীগুলোতে সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিলেন। যদিও তারা সাধারণত কর্মসূচীগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানত, তাদের অনেকে যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছিলেন না বা তাদের আবেদন প্রক্রিয়া গ্রহন ও সম্পূর্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই বিলম্ব এবং সাড়া না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। অনলাইন আবেদনগুলো গ্রহন ও বাছাই নীতিগতভাবে সম্ভবপর ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা অনেক বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এটি সম্ভাব্য ও যোগ্য সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে যেতে এবং প্রায়শই ঘুষ প্রদানে বাধ্য করে।

আদিবাসী বা দলিতদের মতো সামাজিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠী থেকে যারা এসেছেন, তাদের জন্য বাধাগুলি আরও অনেক বেশি, যা সম্ভাব্য সামাজিক বঞ্চণার আরও স্তর সম্পর্কে ধারনা দেয়। বিশেষ প্রতিবেদক অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছেন, বিশেষ করে জলবায়ু অভিবাসী যারা গ্রামীণ এলাকা থেকে রাজধানী শহরে চলে

এসেছেন, তারা উল্লেখ করেছেন যে জাতীয় পরিচয়পত্রের অভাব, বা একটি পরিচয়পত্রের উপস্থাপনা যা পূর্ববর্তী (গ্রামীণ) ঠিকানায় নিবন্ধিত ছিল। এর মানে তারা সাহায্য পায়নি। বাংলাদেশের শহুরে দরিদ্র জনসংখ্যা অত্যন্ত ভ্রাম্যমান: সামাজিক নিরাপত্তায় প্রবেশাধিকার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করা উচিত, কেউ মূলত কোথা থেকে এসেছে তার উপর নয়।

বিশেষ প্রতিবেদক যেমন এমন উদাহরণ শুনেছেন যেখানে কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা সাহায্য আদায়ে সহায়তা করেছেন, তিনি উপজেলা কমিটির প্রতিনিধিদের দ্বারা, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দ্বারা বা বিশেষ করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের দ্বারা আবেদনকারীদের কাছ থেকে ঘুষ চাওয়ার উদাহরণও অসংখ্যবার শুনেছেন। ঘুষ দিতে না পারলে এর ফলশ্রুতিতে সাহায্যও মেলে না। সামাজিক কর্মসূচির জন্য এই ধরনের "প্রবেশের জন্য অর্থ প্রদান" রাজনৈতিক মক্কেলবাদের একটি উৎস। তারা এই কর্মসূচীগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলবে এবং পুরো প্রক্রিয়া শেষপর্যন্ত স্থানীয় অভিজাতদের দখলে চলে যাবে।

এই ধরনের অপব্যবহার, একভাবে, এমন একটি কাঠামোতে অন্তর্নিহিত যেখানে এই সীমিত বাজেটে প্রবেশাধিকার এই স্থানীয় প্রশাসনের স্তরগুলির বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হয়। তবুও, এগুলি রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় যা এটি সঠিকভাবে বহন করতে পারে না। যদিও ডিজিটালাইজেশন সাহায্য করতে পারে, তারপরও চ্যালেঞ্জ থেকেই যায়। উপকারভোগীদের উন্মুক্ত তালিকার মতো প্রক্রিয়া দ্বারা স্বচ্ছতা উন্নত করা যায় যা স্থানীয় অভিজাতদের দখল এবং স্বজনপ্রীতির

ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতেও সাহায্য করতে পারে। এটাও উল্লেখযোগ্য যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ দেখা গেছে স্থানীয় এনজিও এবং সম্প্রদায়ের সংগঠকদের সমর্থনে কর্মসূচীগুলোতে প্রবেশ করতে পেরেছিল। এটি প্রায়শই স্থানীয় এনজিও এবং সম্প্রদায়ের সংগঠকদের সংযোগ তৈরি করতে, বাধা অতিক্রম করতে এবং সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছিল। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচীগুলোকে যেভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয় সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে কর্মসূচীগুলো যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তারা তার সুফল পায় এবং দুর্নীতি ও স্থানীয় অভিজাতদের খপ্পর (এবং এর ফলে পক্ষপাতিত্ব) এবং ফাঁসের ঝুঁকিগুলি কাটিয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।

V. রোহিঙ্গা শরণার্থী

বিশেষ প্রতিবেদক তার সফরের অংশ হিসেবে কক্সবাজার ভ্রমণ করেন, যেখানে তিনি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে দেখা করেন। প্রায় ৯৫০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী এখন কক্সবাজারের ৩৩টি আশ্রয় শিবিরে বাস করছে, এবং আরও ৩০,০০০ জনকে ভাসানচর দ্বীপে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই শরণার্থীদের বেশিরভাগই ২০১৭ সালে গণহত্যা আক্রমন থেকে বাঁচতে পালিয়েছিল।

বিশেষ প্রতিবেদক যা দেখলেন তা তাকে হতবাক করে দিয়েছে। রোহিঙ্গারা তাদের কাজ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় খাদ্যসহ তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণভাবে মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং তাদের সমর্থনকারী বেসরকারী সংস্থাগুলির জন্য বিদ্যমান সহায়তা

কার্যক্রম চালু রাখতে তহবিল সংগ্রহ ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। কক্সবাজার ও ভাসানচরের ৯৭৭,৭৯৮ রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ঝুঁকিতে থাকা ৪৯৫,৪৩১ বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে ২০২৩ জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) ৮৭৬ মিলিয়ন ডলার ত্রাণ তহবিলের আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক দাতাদের প্রতিক্রিয়া অনেকাংশে অপর্যাপ্ত: সফরের সময়, উল্লেখিত ত্রাণ তহবিলের মাত্র ১৭% (মার্চে চালু হয়েছিল) পাওয়া গিয়েছিল। এই অর্থায়নের ব্যবধানের ফলস্বরূপ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে মার্চ ২০২৩-এ তার মাথাপিছু খাদ্য সহায়তা পরিমান প্রতি মাসে ১২ মার্কিন ডলার থেকে কমিয়ে ১০ মার্কিন ডলার করতে হয়েছে এবং জুন মাসে তা আরও কমিয়ে ৮ মার্কিন ডলার করা হবে।

শরণার্থীদের সহায়তার জন্য কাজ করা সংস্থাগুলি তাদের কাজের জন্য প্রশংসার দাবিদার, এবং প্রায় দশ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের উদারতার জন্য প্রশংসা করা উচিত। তবুও, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জেআরপি-তে সাড়া দিতে ব্যর্থতা এবং রোহিঙ্গাদের আয়বর্ধক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দিতে বাংলাদেশ সরকারের অনাগ্রহ মানবিক বিপর্যয়ের শঙ্কা তৈরি করছে। খাদ্যের অনুপাত হ্রাসের ফলে, অপুষ্টি বৃদ্ধি পাবে, যা শিশুদের বিকাশে তীব্র প্রতিবন্ধকতা তৈরী করবে। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।

এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন। যতক্ষণ না তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের শর্ত পূরণ হয়, ততক্ষণ রোহিঙ্গারা যেখানে আছে সেখানে তাদের উপযুক্ত জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সাহায্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কর্তব্য। চুক্তির অনুচ্ছেদ ২(১) বিশেষভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং সহযোগিতাসহ পদক্ষেপ নেওয়ার বাধ্যবাধকতাকে নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং সহযোগিতা তাই চুক্তির সমস্ত পক্ষের জন্য মেনে চলা একটি কর্তব্য, যা "সহায়তা করার অবস্থানে থাকা রাষ্ট্রগুলির উপর বিশেষভাবে বর্তায়", সেইসাথে "অন্যান্য পক্ষের সহায়তা অব্যাহত রাখা"। একইভাবে, শিশু অধিকার কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪ (সিআরসি) চুক্তি অনুযায়ী, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের "আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যে থেকে আয়ত্তাধীন সম্পদের যখন যেখানে প্রয়োজন, তা সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে"। অনুরুপ, সিআরসিতে উল্লিখিত, "রাষ্ট্রগুলি যখন কনভেনশন অনুমোদন করে, তখন তারা কেবল তাদের এখতিয়ারের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের জন্য নয়, বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে, বৈশ্বিক বাস্তবায়নে অবদান রাখার জন্য নিজেরা দায়িত্ব নেয়"।

যদিও এটির সমর্থনে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রদান করা উচিত, বাংলাদেশ নিজেও মানবাধিকার আইনে তার বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করতে পারে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে, "যদিও চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষগুলিকে শরণার্থী এবং অভিবাসীদের প্রবাহকে সর্বোচ্চ উপলব্ধ সম্পদের পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত, তবে তারা নীতিগতভাবে, অব্যাহত সহায়তাকে

সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণে অন্যায়ভাবে সংকুচিত করতে পারে না। এমনকি দেশটি যখন উদ্বাস্তুদের আকস্মিক এবং উল্লেখযোগ্য প্রবাহের মুখোমুখিও হয়।" বিশেষ করে, বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কর্মসংস্থান খোঁজার এবং কর্ম গ্রহণ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, যাতে মানবিক সংস্থাগুলির উপর যে বোঝা তা কিছুটা উপশম হয় এবং শরণার্থীরা যাতে এই ধরনের সহায়তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে তা নিশ্চিত করতে।

রোহিঙ্গাদের আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবেশাধিকার সমর্থন করার জন্য, আইএলও-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় একটি পাবলিক ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে অবকাঠামো নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ করে। উদাহরণস্বরূপ, নদীভাঙ্গন মোকাবেলা করা, বা নদীর তীর, বা বন্যার প্রভাব কমাতে খনন ও জলাভূমি নির্মাণ করা। এই ধরনের কর্মসূচীতে দাতাদের কাছ থেকে তহবিল পাওয়া সহজ হতে পারে, যেহেতু উন্নত দেশগুলো প্রতি বছর যৌথভাবে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জোগাড় করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর চাপ কমানো এবং অভিযোজন চাহিদাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য – একটি লক্ষ্য যাতে ২০২০ সালেই পৌঁছানো উচিত ছিল। সবুজ জলবায়ু তহবিল দ্বারা প্রশমন কর্মসূচীর তুলনায় এই অভিযোজনেও (জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণসহ) ব্যাপকভাবে অর্থসংকটে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যতটা সমর্থন পাচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি সমর্থন পাওয়ার যোগ্য: এখনই সময় শরণার্থীদের গ্রহণ করার ক্ষেত্রে

দেশটির উদারতাকে উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সংহতির সাথে একীভূত করা।

VI. জলবায়ু পরিবর্তন

বিশেষ প্রতিবেদক কুড়িগ্রামে জলবায়ু অভিবাসীদের সাথে সাক্ষাত করেন, যারা উপকূলীয় এলাকা যা "চর" নামে পরিচিত এবং নিচু এলাকায় বসবাস করেন। তারা নিয়মিত বাস্তুচ্যুতি এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে বাংলাদেশের অবদান ০.৪৮% এরও কম। তবুও, ২০২১ গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স বাংলাদেশকে চরম আবহাওয়ার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় সপ্তম স্থানে রেখেছে: এই কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক মি. ইয়ান ফ্রাই তার প্রথম সফরসূচীতে বাংলাদেশকে রেখেছিলেন। তিনি ৪ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ সালে বাংলাদেশ সফর করেন।

জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি - আনুমানিক ৯০ মিলিয়ন বাংলাদেশি - উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করে, যাদের মধ্যে ৫৩ মিলিয়ন খুব বেশি ঝুঁকির মুখে থাকেন। তিনটি জলবায়ু ঝুঁকি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গড়ে প্রতি পাঁচ বছরে একবার দেশব্যাপী খরা হয়। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল, যা দীর্ঘদিন ধরে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ এবং জলাবদ্ধতার শিকার ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে এ অঞ্চলে পানির লবণাক্ততা সাম্প্রতিক সময়ে আরোও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের নিচু ভৌগলিক অবস্থানের কারণে দেশটি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি,

ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার ঝুঁকিতে থাকে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫ ফুটেরও কম উচ্চতায় অবস্থিত এবং জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে: উপকূলীয় অঞ্চল থেকে ইতিমধ্যেই নগর অভিমুখে ব্যাপক স্থানচ্যুতি ঘটছে। অনিয়মিত এবং তীব্র বর্ষণের কারণে গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকায় পানির উচ্চতা ও নদীর স্রোত তীব্র হয়। ভবিষ্যতে উত্তরাঞ্চলে আরও বন্যা দেখা দেবে: নদী ভাঙনের ফলে ইতিমধ্যে প্রতি বছর ৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

জনসংখ্যার জলবায়ু-সংবেদনশীল জীবিকা, যা নির্ভর করে শস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, এবং মাছ ধরার ওপর, সেইসাথে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে নিম্নমানের আবাসন এবং অবকাঠামো, বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল করে তোলে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে জলবায়ু অভিবাসন বাড়বে। সর্বশেষ ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দশ মিলিয়নেরও বেশি বাংলাদেশিকে জলবায়ু উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সাতজনের একজন বাস্তুচ্যুত হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গরীব জনগোষ্ঠী। বিবিএস-এর একটি ঝুঁকি মূল্যায়ন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ২০২২ সালে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগের ফলে ক্ষয়ক্ষতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (যাদের গড় বার্ষিক আয় ৩১,১০০ টাকা) আয়ের ৯৭.১৭% পর্যন্ত হতে পারে। শীর্ষ আয়ের জনগোষ্ঠীর (গড় আয় ৭২২,৯০৩) জন্য এটি মাত্র ৯.৩৩%। অন্যভাবে বললে, সবচেয়ে দরিদ্র ২০% মানুষ ধনী ২০%-এর তুলনায় ১০.৪ গুণ বেশি দুর্যোগ ঝুঁকিতে: দুর্যোগের

প্রভাবে পূর্ব উল্লেখিত গোষ্ঠীর প্রায় সমস্ত আয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যেখানে ধনী জনগোষ্ঠী ধাক্কা সহ্য করতে অনেক বেশি সক্ষম। আপনি যত দরিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আপনার আয়ের অনুপাতে আপনি তত বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হন।

বিশেষ প্রতিবেদক বিশেষত তিনটি চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছেন। প্রথম চ্যালেঞ্জ হল দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত নগরমুখী মানুষ। বর্তমানে বাংলাদেশের শহুরে বস্তিতে বসবাসকারীদের ৫০% পর্যন্ত সেখানে আসার কারণ হলো বন্যার ফলে গ্রামে তাদের নদীতীরবর্তী বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া। এবং ঢাকার বস্তিবাসীদের ৭০% পরিবেশগত অভিবাসী। এই জলবায়ু উদ্বাস্তুরা পর্যাপ্ত আবাসন, পয়োনিষ্কাশন এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাহীন ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে বস্তিতে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তারা তাদের সামাজিক সংহতি ও সংযোগসমূহ হারায় যার উপর তারা কঠিন সময়ে নির্ভর করতে পারে। অবশেষে, অন্তত প্রাথমিকভাবে, তারা তাদের নতুন জায়গায় বাসিন্দা হিসাবে বিবেচিত হয় না, এবং তারা ভোট দিতে পারে না: তাই তাদের সুবিধাভোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে তাদের সাহায্য ও অনুদান প্রদানে রাজি করাতে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা কম। এটি তাদের সামাজিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত করে যখন তাদের তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যারা স্থানান্তরিত হয়েছে তারা দেশের ভেতর বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি যা অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত নীতিমালায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তারা যখন ফিরে যেতে চায় এবং যতক্ষণ না তারা ফিরে যায়, যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, রাষ্ট্র কতৃক সমর্থন পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হল বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির অপর্যাপ্ততা । জলবায়ু অভিবাসীদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন কর্মসূচীগুলো শক্তিশালী করতে হবে। অক্টোবর ২০২২-এ উপস্থাপিত বাংলাদেশের জন্য জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় (২০২৩-২০৫০) অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে জীবিকা সুরক্ষার উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যাপ্তি প্রচলিত কর্মসূচী যেমন কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য), চাহিদা মোতাবেক নগদ স্থানান্তর, শুকনো খাবারের জন্য তহবিল ও পুনর্বাসনের, এবং দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী পদক্ষেপ যেমন জরুরি ওষুধের সরবরাহের মতো উদ্যোগগুলিকে মিশ্রিত করে বাড়ানো উচিত। উদ্ভাবনী উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ভর্তুকিযুক্ত বীমা-ভিত্তিক ঝুঁকি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া, জলবায়ু-সহনশীল বাড়িঘর প্রতিষ্ঠা [...], স্বল্প সুদে ঋণ ইত্যাদি। তবে, জলবায়ু ঝুঁকির বিরুদ্ধে সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে এটি যথাযথ নয় । করদাতাদের অর্থ দিয়ে অর্থায়ন: বাংলাদেশ উদাহরণ হিসেবে এই ধরনের একটি কর্মসূচী হাতে নিতে পারে, অন্যান্য ধরনের অভিযোজিত সামাজিক সুরক্ষা থেকে যা অনুপ্রেরণা পেতে পারে। সর্বশেষ তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হলো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে ২০১৫-২০৩০ এর সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু মানবাধিকারের ভিত্তিতে একটি ঝুঁকি হ্রাস কৌশলপত্র প্রনয়ন করা। সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক তার নির্দেশিকা নীতির অংশ হিসাবে মানবাধিকারকে উদ্‌ধৃত করে, যেখানে একটি সত্যিকারের মানবাধিকার-ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশলে খরা, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো চরম ঘটনাগুলির ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্তদের

দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অবহিত করা হবে; যে এই ধরনের পদক্ষেপের সুবিধাভোগীরা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, এমন শর্তে যা বৈষম্যহীনতার নীতি মেনে চলে এবং যে সুবিধাভোগীদের অধিকার-ধারক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা সরকারী সংস্থাগুলি যাদের কাছে দায়বদ্ধ।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপর্যয়ের শিকারদের শুধুমাত্র মানবিক সহায়তা প্রদান করা উচিত নয়, তাদের সাথে কেবল সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত নয়: বরং তারা প্রকৃত অধিকারী, এবং তাদের অধিকার রয়েছে সহায়তা কর্মসূচী প্রনয়ণে অংশ এবং সহায়তা প্রদানের জন্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষকে দায়বদ্ধ করার। তবে এটির জন্য প্রথমে প্রয়োজন হলো এই ধরনের দায়িত্বগুলো স্পষ্টত সংজ্ঞায়ন, অন্য কথায়, দায়িত্বগুলি বিভিন্ন বিভাগে বরাদ্দ করা, এবং দুর্যোগের আঘাতের পরে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য বাজেটের বিধান করা।

VI. উপসংহার এবং সুপারিশমালা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের হার কমাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে। যদিও দেশটির এই অগ্রগতি ভঙ্গুর। দেশটি একটি প্রবৃদ্ধির মডেলের উপর নির্ভরশীল, যা স্বল্পোন্নত অবস্থা থেকে উত্তোরণের পরে পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং বাংলাদেশের প্রয়াস সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর সহনশীলতা জোরদার করার জন্য যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির বিরুদ্ধে। বিশেষ প্রতিবেদক অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিচের সুপারিশগুলি প্রনয়ণ করেছেন:

১. দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতির জন্য উন্নত জবাবদিহিতা, এবং মানবাধিকার সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রয়োজন। এছাড়াও সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি, যাকে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়, তাকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। এবং এর জন্য দেশীয় সম্পদের আরও সংহতকরণ প্রয়োজন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন স্থগিত করা উচিত। বৈষম্য-বিরোধী আইনী কাঠামো গ্রহণ করা উচিত। এবং কর সংস্কারের মাধ্যমে করজাল প্রসারিত করে দেশের রাজস্ব আহরন বৃদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ কর থেকে আসা রাজস্বের অনুপাত বাড়ানো উচিত।

২. যেহেতু বাংলাদেশ তার অর্থনীতি এবং বিশেষ করে এর রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে চায়, দেশটিকে তৈরি পোশাক শিল্প এবং এর বাইরেও কাজের অবস্থা এবং মজুরি উন্নত করতে মনোযোগ দিতে হবে। ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। নিজস্ব সুনামের স্বার্থে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলিকে অবশ্যই এই বিষয়ে তাদের দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে, এবং উচ্চ মজুরি এবং শ্রমিক ইউনিয়নের অধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ইপিজেডগুলিতে ইউনিয়ন গঠন ও যোগদানের অধিকার এবং সামষ্টিক দর কষাকষিরও অনুমতি দেওয়া উচিত।

৩. পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত এবং ব্যাপ্তি প্রসারিত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা উচিত এবং বিভিন্ন কর্মসূচীগুলো সুবিন্যস্ত এবং যুক্তিযুক্ত করা উচিত। দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা মানুষেরা ঘুষ প্রদানে অক্ষমতার কারণে বা সামাজিক সংযোগের অভাবের কারণে যেন মূলধারা থেকে বাদ পড়ে না যায়,

তা নিশ্চিত করতে সুবিধাভোগী হওয়ার যোগ্যতার শর্তাবলী সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করা উচিত। এবং যারা বাদ পড়েছেন তাদের কাছে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা আরও প্রবেশগম্য হওয়া উচিত। সামাজিক সুরক্ষার একটি নির্দিষ্ট শাখা জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপর্যয়ের শিকারদের রক্ষায় হওয়া উচিত, বিশেষ করে যখন এটি মানুষকে স্থানচ্যুতির দিকে ধাবিত করে ।

৪. প্রত্যাবাসনের শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যেখানেই থাক, তাদের মানবাধিকারকে সম্মান করতে হবে। মানবিক সাহায্য প্রদানকারী অংশীজনদের ওপর বোঝা কমানোর জন্য, রোহিঙ্গাদের কর্মসংস্থান গ্রহণ এবং আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। ২০২৩ সালের জয়েন্ট রেসপন্স প্লানের প্রতি সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব রয়েছে।